আনবাড়ি

লুনা রুশদী

আনবাড়ি

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

আমার দাদি সৈয়দ বানুর স্মৃতির উদ্দেশে

বুবু,

এই পরবাসে আপনার কথা মনে পড়ে। যত একা হচ্ছি তত বেশি। একটা সিঙ্গল খাটে আপনি আর আমি পাশাপাশি কত বছর! তবু আপনার মন বুঝি নাই। আপনার স্নেহ, আদর, আমাকে আগলে রাখা...মনে আছে আমার একটু মনোযোগের আশায় কী আপ্রাণ চেষ্টা আপনার। সন্ধ্যাবেলায় আমার পড়ার টেবিলের পেছনে নীরবে এসে দাঁড়াতেন। সাদা শাড়ি, চিকন পাড়। কোঁচকানো চামড়ার ফরসা মুখে ঘোমটা টানা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া দাঁড়ানোর ভঙ্গি, আমি বিরক্ত হয়ে বলতাম 'আপনি এমন রবীন্দ্রনাথের মতন দাঁড়াইয়া আছেন কেন?' তারপরেও আপনি হাসতেন বুবু, তারপরেও মাথায় হাত বোলাতেন। তখন আমি ব্যস্ত ছিলাম কত তুচ্ছ দৈনন্দিনতায়। কতভাবে রাগ করেছি, তাচ্ছিল্য ভরা কথা বলেছি, এখন ভাবলে লজ্জিত হই।

এখানে একলা দুপুরে যখন পাশের বাড়ির টিনের চালে ঘুঘু ডাকে আমি আপনার কথা ভাবি। গরমের দিনে দুপুর বেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আপনি বারান্দায় বসতেন। সামনের কড়ইগাছটার ডালে বসে কয়েকটা কাক যখন ডাকতে ডাকতে হাহাকার ছড়াত আপনার যে কেমন লাগত এখন আমি টের পাই। খুব ইচ্ছা করে আপনার পাশে বসতে, শুনতে আপনার অতীতচারণ, সেই সব দিনের গল্প যখন শীতকালে মাটির উনুনের আঁচে সবাই খুব কাছাকাছি থাকত...আপনি তো কোথাও নাই বুবু। তবু আছেন, ওই ঘুঘুর ডাকের ভেতরে, আমার আনবাড়িতে...ভরন্ত দিনের স্মৃতি হয়ে।

— লুনা

‘চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি...’

Your absence has gone through me
Like thread through a needle.
Everything I do is stitched with its colour.

W.S. Merwin

চোখ পর্যন্ত পৌঁছায় না তোমার হাসি... ।

আর কী যেন বলছিল? একটুখানি চোখ খুলেই বন্ধ করে ফেললাম। আমি তো ঘুমাচ্ছি। নাকি? স্বপ্ন, হ্যাঁ তাই হবে। বাকি কথাটা শোনা হলো না তো। এ রকমই আমি, অর্ধেক মানুষ। আজকাল একটা বইও পড়ে শেষ করি না...আধাআধি গল্পগুলো ঘুরপাক খায় মাথার ভেতর, মেঘের মতন। নাকি গাভি? কি যেন কবিতাটা ছিল না? ‘কোথায় যেন বাজছে বেণু, মেঘের মতন চড়ছে ধেনু...’ ধুত্তোরি! এটা তো আমি বানালাম। ওইটা শক্তির কবিতা, কেমন দুঃখী দুঃখী, শান্ত কুয়াশা মোড়ানো... ‘যেখানে মেঘ...যেখানে মেঘ... ।’

এদের কি কোনোদিন চিল্লাচিল্লি থামবে না? কী হয়েছে মানুষের আজকাল? প্রচণ্ড শব্দে ফেটে না পড়লে বুঝি নিজের অস্তিত্ব জানান দেওয়া যায় না? যত জোরে তুমি চিৎকার করবে, ততটাই বেঁচে আছ! ল্যাপটপটা অন করেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন অন্ধকার ঘরে

মনিটরের নীল আলো কেমন অতিপ্রাকৃত মনে হয়। এখানে-সেখানে জমাট বাঁধা অন্ধকার। ওই কোণের দিকে বড়ো চারকোনা অন্ধকারটা আমার সুটকেস। ডালা খুলে পড়ে আছে দুইদিন ধরে। ভেতরে কাপড়-চোপড়, বই, চিরুনি, ক্যামেরা, ভাংতি পয়সা সব মিলেমিশে সরগরম অবস্থা। আমার কিছুই গোছাতে ইচ্ছা করে না, খালি ঘুমাই আমি, আর মাঝে মাঝে জাগি।

বাথরুমের ট্যাপটা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। শুনতে পাই। বাইরে কেউ একজন কণ্ঠনালির সীমার বাইরে গিয়ে চিৎকার করল মনে হয়। কিম্ভূত এক শব্দে বাতাস ভারী হয়ে গেল—কে বলবে এই শব্দ মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত? কেউ কোথাও কোনো আলাপ করছে না, হাসছে না, এমনকি গানও শুনছে না। শুধু ওই প্রাচীন কোনো প্রাণীর আর্তনাদের মতন চিৎকারের সাথে মিশে যাচ্ছে রাস্তায় গাড়ি চলাচলের হুশ হুশ শব্দ। শনিবার রাতে বেরিয়েছে মানুষ। কেউ না কেউ সব সময়ই কোথাও না কোথাও যাচ্ছে।

আমরাও যেতাম অকল্যান্ডে—শুক্রবার আর শনিবারের রাতগুলো বিশেষ করে। আর কী আজব আজব কাজ যে করতাম! 'পরিণীতা' দেখতে গিয়েছিলাম সিলভিয়া পার্ক শপিং সেন্টারের সিনেমা হলে। আমি আর রাসেল নিজেরাই এত বকবক করতে করতে সিট খুঁজছিলাম যে সামনের সারির লাইনধরা মাথাগুলো যে জ্যান্ত মানুষের শরীরের সাথেই জোড়া দেওয়া আছে, খেয়ালই করি নাই। আমার ঠিক সামনেই কালো মাশরুমের মতন দেখতে কোঁকড়া চুলের এক লোকের মাথায় পপকর্নের প্যাকেট রেখে দিয়েছিলাম। মাথায় গরম লেগে লোকটা চোখ ছানাবড়া করে আমার দিকে যখন তাকাচ্ছিল, আমি হাসির চোটে আর কিছুতেই 'সরি' বলতে পারছিলাম না। এই সিনেমারই শেষের দিকে মারাত্মক সিন ছিল! পাশের বাড়ির নায়িকা সাইফ আলী খানকে বাড়িঘর সব দানখয়রাত করে চলে যাচ্ছে আর সেইদিনই আবার নায়কের বিয়ে হচ্ছে। ওদের দুই বাড়ির মাঝে ইটের দেওয়াল উঠে গেছে ততদিনে। বিদ্যা বালানের বোনজামাই সঞ্জয় দত্ত

নায়ককে বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠিয়ে এনে বাড়ির দলিলের সাথে সাথে এতদিনের সঠিক ইতিহাস পেশ করল তার কাছে। তাইতেই নায়ক প্রবল বিক্রমে ফুঁসতে ফুঁসতে মাঝখানের ইটের দেওয়ালের দিকে ছুটে গেল। আশপাশে মুগুর না থাকায় টিউবওয়েল না কী একটা যেন কয়েক টান মেরে উপড়ে ফেলে সেইটাই গদার মতন ধরে সমানে বাড়ি দেওয়া শুরু করল ইটের দেওয়ালে। বিয়েবাড়ির দাওয়াতিরা 'ভাঙ্গো শেখর, ভাঙ্গো শেখর' বলে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। দোতলার বারান্দায় দাঁত কিড়মিড় করছেন নায়কের ভিলেন বাবা সব্যসাচী চক্রবর্তী আর দেওয়ালের ওই পাশে সপরিবার নায়িকা বাড়ি থেকে বের হয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। নায়ক দেওয়াল ফুটা করার আগ পর্যন্ত এই অনন্ত গৃহত্যাগ। দর্শকরা উত্তেজিত, শোকে বিহ্বল। মাঝখানে আমি আর রাসেল হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে পড়েই যাচ্ছিলাম। রাসেল বলছিল 'হারামজাদা দেওয়াল পরে ভাঙ্গিস, গেট দিয়া বাইর হ, গেলগা কিন্তু!' আমার হেঁচকি উঠে যাচ্ছিল আর চোখে পানি।

আরেকটা প্রিয় জায়গা ছিল বোটানি শপিং সেন্টার। গ্লেন ইডেন থেকে এক ঘণ্টার ড্রাইভ। প্রায় প্রতি শনিবার সকালে যেতাম। সেই সুশির দোকানটার জানালার পাশের টেবিলটা কী যে আরামের ছিল। দোকানের নামটা কখনো ঠিক করে দেখিই নাই! সব সময় বলতাম 'আমাদের সুশিশপ'। দোকানের সবাই চিনত আমাদের। মাঝে মাঝেই মিসো স্যুপটা ফ্রি পেয়ে যেতাম। কাঠের চারকোনা ভারী অথচ ছোটো টেবিলের দুইপাশে মানানসই কাঠের চেয়ার। জানালার ওপাশে দোকানের বাইরে আরও কিছু চেয়ার-টেবিল আর আশপাশে ছড়ানো-ছিটানো দোকান। রাসেল সব সময় নিত ভাতের ওপরে স্যামন ভাজির সাথে টেরিয়াকি সস্ আর আমি টুনা-অ্যাভোকাডো রোলের সাথে শোলার কাপে করে মিসো স্যুপ। ছোট্ট কাঠের টেবিলের দুইপাশে কত কাছাকাছি ছিলাম আমরা। আমি ওর দু-তিনদিনের না-কামানো গালে হঠাৎ দুই-একটা সূক্ষ্ম সাদা বিন্দু দেখতে দেখতে বলতাম—'আহারে জামাইটা বড়ো হয়ে গেছে, বিয়া দিতে হবে।' রাসেল পরম আপ্লুত

মুখে বলত 'দিবি? দে না! ওই যে কমলা রঙের জামা পরা-টার সাথে।' তারপর আমরা কিছুক্ষণ মেয়ে দেখতাম, ছেলে দেখতাম, অনেক কথা বলতাম অথবা কিছুই বলতাম না। মাঝে মাঝে বৃষ্টি ছিল আর মাঝে মাঝে রোদ। মাঝে মাঝে রাসেল সারাটা সময় পার করত সেলফোনে গেম খেলে। আমি তখন জানালায় দেখতাম হাসি-খুশি কিংবা বিষণ্ন মানুষ, দেখতাম রং, কিংবা মেঘ আর বাচ্চাদের দৌড়ঝাঁপ। কখনো ঝাঁজালো ওয়াসাবির সাথে মিশে যেত আসন্ন ঝড়ের গন্ধ আর কখনো রোদ ও ধুলার গন্ধ মিলেমিশে আরেকটু তাতিয়ে তুলত চারপাশ।

প্রথম প্রথম অকল্যান্ড পৌঁছে ন্যান্সিবুড়ির গাব প্লেসের বাড়ির মেঝেতে বিছানা করে ঘুমাতাম আর মাঝরাতে পোকার কামড়ে ঘুম থেকে উঠে সারারাত কেটে যেত পোকা মারার চেষ্টায়। সিডনিতে ফেলে যাওয়া বন্ধুদের যাকেই জানাতাম এই বৃত্তান্ত সবাই প্রথমেই বলত 'তোদের গাব পাইয়া গাব ধরাইয়া দিছে।' সেই বাড়ির রান্নাঘরের পেছনে ভাঙাচোরা দুই ধাপ কাঠের সিঁড়ি ছিল। কোনো কোনোদিন সন্ধ্যা হওয়ার ঠিক আগে আমি সেই সিঁড়িতে বসে থাকতাম গালে হাত দিয়ে—একমাত্র সম্পত্তি আটশ ডলারে কেনা পুরানো লাল রঙের হোন্ডা সিভিক গাড়িটার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি দিত কয়েকটা গাছের ডাল। ভাবতাম কেমন করে এলাম এখানে। এই শহর কী বিপুল বিদেশ যেখানে কোথাও আমার কোনো ছাপ নেই!

মনে পড়ত সিডনির ব্ল্যাকটাউনে ফেলে আসা ডেভিট স্ট্রিটের সন্ধ্যাগুলো। মাঝে মাঝে বারান্দায় দাঁড়ালে সামনের উঁচু গাছটার গা থেকে কেমন ভেজা ভেজা দারুচিনির মতন গন্ধ আসত। গাছের নাম জানতাম না, তাই নাম দিয়েছিলাম দারুচিনিগাছ আর ওই বারান্দাটা আমার একান্ত দারুচিনি দ্বীপ। তার পাতার আড়ালে কয়েকশ পাখি লুকিয়ে থাকত। হঠাৎ বিনা নোটিশে একসাথে উড়াল দিত সব্বাই, কী ভীষণ তাদের ডাকাডাকি, উথালপাথাল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরেই সেই রঙিন পাখিদের চাদরটা উড়তে উড়তে সূর্যাস্তের গোলাপি মেঘটুকুকে ভেদ করে একদম নেই হয়ে যেত। তবু গাছের

পাতায় লেগে থাকত কিছুক্ষণ আগের নিবিড়তার স্মৃতির চিহ্ন হিসেবে পালকের ওম, কখনো দুই একটা আস্ত পালক, বাতাস বহন করত ওদের কিচিরমিচির ডাকাডাকির প্রতিধ্বনি।

গাছটার সামনেই একটুখানি বাগান পার হয়ে একটা ফুটপাথ, তার ওপাশে ছোটো রাস্তা, তারপরে একটুখানি মাঠ এবং সমান্তরালে রেললাইন। খুব বিষণ্ন একটা রাত মনে আছে। সবাই ঘুমাচ্ছিল, যেন সারা পৃথিবী। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম মেলবোর্নে ফেলে আসা আমার ঘরটার কথা, যে ঘরটায় দেওয়ালজোড়া জানালা ছিল। আর জানালার বাইরেই আম্মার বাগান। গরমকালের দুপুরগুলোতে ঝাঁজালো রোদ আর লেবুপাতার গন্ধ মিলেমিশে আমার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ত। বাগানে দেখতাম রোদের স্বচ্ছ পর্দা গ্যারেজের পাশের বেড়া বেয়ে লতিয়ে ওঠা প্যাশন ফলের গাছ পার হয়ে যাচ্ছে দুলে দুলে। হোলি-ট্রির পাতা চিকমিক করত। আর আমি তখন ঢাকার বাসার বারান্দায় আমার একলা দুপুরগুলোর কথা মনে করে মন খারাপ করতাম। এ রকম অসংখ্য অতীত দুপুর ও সন্ধ্যার স্মৃতি ছুটে আসছিল সেই রাতের দিকে। সামনের একমাত্র ল্যাম্পপোস্টটার আলোর আভা কুয়াশার সাথে মিলেমিশে বায়বীয় রাস্তা তৈরি করতে করতে অচেনা করে তুলছিল চারপাশ। গন্ধরাজ ফুলের গন্ধ আসছিল কোত্থেকে যেন। বাতাসের চলাচল আর পাতায় পাতায় শিরশিরানির শব্দ ছাড়া কিছুই ছিল না। ঠিক তখনই শেষ ট্রেন পার হলো ব্ল্যাকটাউন স্টেশন। বারান্দা থেকেই দেখলাম আলোজ্বলা ট্রেনের কামরাগুলোতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকজন। কারো হাতে খবরের কাগজ, কারো বই, কেউ ঘুমে আর কারো চোখ জানালায়। যেন মৃতদের শহর পার হয়ে গেল অপার্থিব আলোর বুদ্বুদ। অতদূর অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল ট্রেনের কামরার মানুষগুলো একে অপরের কত কাছের আর নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন বাতাসে ভেসে বেড়ানো প্রাচীন দীর্ঘশ্বাস। ট্রেনটা চলে যাওয়ার পরেও তার চলার শব্দের অনুরণন মিশেছিল কুয়াশায়।

তারও অনেক পরে ক্লান্ত চপ্পলের শব্দ তুলে ছেলেটা হেঁটে আসছিল। কাঁধে ব্যাক্‌প্যাক্। মুখ নিচু। আমি বারান্দা থেকে ওকে দেখার আগেই ওর হেঁটে আসার শব্দ পেয়েছিলাম। যখন ল্যাম্পপোস্টের আলোর আওতায় পা ফেলল, দেখলাম ঝাঁকড়া চুল নেচে উঠছে প্রতি পদক্ষেপের সাথে, বাতাসে এলোমেলো হচ্ছে। জিন্স ছিল পরনে, কী রং মনে নেই আর একটা লম্বাহাতা টার্টলনেকের ওপরে হাফহাতা ডোরাকাটা টি-শার্ট। দোতলার বারান্দা থেকে একদৃষ্টিতে দেখছিলাম ওকে আমি, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। ঠিক আমার বারান্দার সামনে এসে বাগানটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটা। গন্ধরাজের গন্ধ পাচ্ছিল নাকি সেও? তারপর আচমকা মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে—মুখভর্তি হাসি। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ঝলমল করছে চোখ। আমি হাসলাম। মাঝে মাঝে সারা জীবন হেঁটে হেঁটে শুধু একটা মুহূর্তের কাছেই পৌঁছাই আমরা। ভাবলাম 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি...'।

গাব প্লেসের ভাঙা সিঁড়িতে এসব ভাবতে ভাবতে রাত হয়ে গেলে রাসেল এসে পাশে বসত।

'চল্ ড্রাইভে যাবি?'

ততক্ষণে আমাদের হোন্ডা সিভিক পার হয়ে উল্টোদিকের বাড়ির প্লামগাছের ডালের ফাঁকে চাঁদ। মন খুশি হয়ে উঠত। উঠে দাঁড়াতাম আর কোল থেকে নরম বিড়ালের মতন বিষণ্নতা লাফিয়ে নেমে মিশে যেত অন্ধকারে। যেন ছিলই না কোনোদিন! ঝলমল করতে করতে বলতাম—

'ভ্লাদিরেও নিয়া যামু!'

ভ্লাদি মানে ভ্লাদিমির, দুইটা গোল চোখ আর লেজওয়ালা হিপোপটমাস চেহারার একটা কুশন। রাসেল কিনে দিয়েছিল সিডনিতে। আমি অনেক খুঁজে নাম বের করেছিলাম পুঠন, সেটা রাসেলের কাছে এসে ভ্লাদিমির পুটিন হয়েছিল। রাসেল আমাকে বিড়াল ডাকত, নিজে ছিল ভাল্লুক। তো ভাল্লুক আর বিড়ালের ক্রস-ব্রিডে একটা তুলার হিপোটোমাসের জন্ম নেওয়া খুবই সম্ভব। তাই আমাদের বিছানা বালিশের সাথে সাথে

জড় হয়েও নীরব জীবন্ত একটা উপস্থিতি ধারণ করে সে থাকত। সিডনি থেকে অকল্যান্ডেও ভ্লাদি সাথেই ছিল। সে যে শুধুই কুশন একটা, ভুলেই গেছিলাম আমরা, তাকে তাই পুষতাম। আচ্ছা ভ্লাদি এখন কই? নিয়ে এসেছি কি তাকে?

শেষ পর্যন্ত নামতেই হচ্ছে বিছানা থেকে। বিছানা বলতে পাতলা তোশক দেওয়া একটা কাঠের ফিউটন। তার ওপরে চাদর বিছিয়ে নিয়েছি। কম্বলের ওম ছেড়ে বের হতে কেঁপে উঠছি, যদিও সেপ্টেম্বর মাস এখন। কাগজ-কলমে বসন্ত শুরু হয়ে গেছে সেপ্টেম্বরের এক তারিখ থেকে। এমনকি রাস্তার গাছগুলোও সবুজ হয়ে উঠছে আবার, ফুল ফুটছে। ওয়েলিংটন শহরের এই ঘরে তবু থমকে রয়েছে শীতকাল। নাকি আমিই তাকে বাক্সবন্দি করে নিয়ে এলাম অকল্যান্ড থেকে? মেঝেতে ওই ডালা খুলে পড়ে থাকা বাক্সটা তা হলে অন্ধকারের সাথে সাথে শীতও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ঘরটাকে এখনো আমার ঘর বলা যাচ্ছে না। সত্যি কথা হলো দুইদিন আগে সেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হওয়া প্রায় সন্ধ্যায় এখানে এসে যখন ঢুকলাম, কেমন বিধ্বস্ত লাগছিল। এই বিছানাটা তখন সোফা আকারে ওইদিকের দেওয়াল ঘেঁষে ছিল। সোফার ঠিক উপরেই কালো ফ্রেমের মধ্যে একটা ছবির প্রিন্ট। বনের মধ্যে ছোটো ছেলে পড়ে গিয়ে কাঁদছে, মুখ নিচু, এলোমেলো চুলগুলোকে চুল বলে চেনা যাচ্ছে না, গাছের পাতাও হতে পারে কিংবা কিছুর ছায়া, ছেলেটাও যে একটা ছেলেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার মতন কিছু নাই ছবিটাতে, তারপরও বোঝা যায় একটা নুয়ে পড়া ঘাড়ের হালছাড়া ভঙ্গি, মাটির ওপরে পড়ে থাকা হাতের পাতার সমর্পণের ভাব। তার একাকিত্ব ঘিরে রয়েছে গাছের পর গাছ।

ঘরে ঢুকেই ছবিটা আমি যে ঠিক এমনি করেই দেখেছিলাম তা কিন্তু না। গত দুই দিনে ঘুম আর জেগে ওঠার ফাঁকে ফাঁকে ওই ছবিটার দিকেই চোখ চলে গেছে, যেহেতু ফিউটনটাকে বিছানা বানানোর পরে ওই ছবির দেওয়ালের দিকেই পা রেখে শুয়েছি আমি।

পাশেই দেওয়াল জোড়া বেগুনি পর্দা, এখনো সরিয়ে দেখা হয়নি। আর আসবাব বলতে রয়েছে ছোটো চারকোনা টেবিলের সাথে দুইটা চেয়ার, একটা কাপড় রাখার আলমারি আর একটা চেস্ট অব ড্রয়ারস। এটা একটা ফার্নিশড স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট—এক ঘরের দুনিয়া। এর মধ্যেই বাথরুম, রান্নাঘর। আসবাব সব বাড়িওয়ালার, তাই ভাড়া একটু বেশি। এ রকমই ভালো, আমার তো বিছানা থেকেই নামতে ইচ্ছা করে না, কীভাবে এতসব কিনতাম আমি না থাকত যদি?

সদর দরজা খুলে মিটারখানেক দৈর্ঘ্যর একটা করিডর মতন জায়গায় রান্নাঘর। একপাশে ছোটো বার ফ্রিজ, উপরে সিংক, মাইক্রোওয়েভ। তার পাশে স্টোভ, ওভেন, একটা এক ড্রয়ারের ডিশ ওয়াশার আর উপরে দেওয়ালে লাগানো ক্যাবিনেট। তার ভেতরে প্লেট, গ্লাস, কাপ, হাঁড়ি-পাতিল, চামচ সব রাখা আছে। আমার মতন ঘটি-বাটি সম্বলটুকুও না থাকনেওয়ালাদের জন্য বেশ আদর্শ ব্যবস্থা। রান্নাঘরের এক মিটারের পরে আরেকটা দরজা, সেখান থেকেই অফিশিয়ালি ঘরের শুরু। একপাশে রান্নাঘরের সমান্তরালে বাথরুম।

আমার ডালা খোলা সুটকেসটা পড়ে আছে বাথরুমের সামনেই ফুটখানেক জায়গা পার হয়ে, উল্টে দেওয়া কচ্ছপের মতন অসহায়। ওর পেট থেকে ইন্সট্যান্ট নুডলসের প্যাকেট বের করার জন্য খুলেছিলাম গতকাল। খুঁজতে খুঁজতে কিছু কাপড় ছিটানো হয়েছে কার্পেটে। আছে ছোটো-বড়ো আট দশটা ব্যাগ ভর্তি বই, ডিভিডি আরও সব হাবিজাবি। আট বছরের সংসার জীবনের কবরের ওপরে গজিয়ে ওঠা ঘাসের মতন এইসব আমার হাতে উঠে এসেছে। হিন্দু হলে আরেকটা জবরদস্ত উপমা দিতে পারতাম এখানে—সংসার জীবনের মৃতদেহ ছাই হয়ে যাওয়ার পর বিসর্জনের অস্থির মতন এদের সাথে নিয়ে এসে কার্পেটে ঢেলে দিয়েছি আমি। বাথরুমের জানালা দিয়ে ওপাশের ফ্ল্যাটগুলোর আলো ঢুকছে, সেই আলো দরজা পার হয়ে ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে অনেকখানি ফুরিয়ে ফেলছে নিজেকে। এই আধমরা কাঁপা আলোয় ছড়ানো-ছিটানো ব্যাগগুলোকে দেখলে মনে হয় ভূতের মিটিং।

ছোট্ট এক লাফে সুটকেস পার হয়ে গিয়ে বাথরুমের বেসিনের ট্যাপটা বন্ধ করলাম। রাত বোধহয় অনেক হয়েছে। ওদের পার্টি শেষ। এখনো পড়ে থাকা কয়েকজনের দুই-একটা ছুড়ে দেওয়া কথার টুকরা যেন কফিন থেকে উঠে আসছে। বাতাসের শব্দ। শুনতে পাই সামনের ইটবিছানো সর্বজনীন উঠানে একটা খালি কাচের বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশ। গাড়ি চলাচল কমে এসেছে। বাইরের সিঁড়িতে ক্লান্ত পা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেউ, যেন কোনোদিন আর বাড়ি ফেরা হবে না তার। বেসিনের সামনের আয়নায় বাইরের আলোয় আমার মুখটা আবছা, ধোঁয়া ধোঁয়া। লাইট জ্বালব? থাক এ রকমই ভালো। বেশ খিদা লেগে গেছে। দুপুরে একটা নুডলস খেয়েছিলাম। এ ছাড়া আর কিছু নাই। অথচ এখন এই নুডলস বানানোর ঝামেলাটুকুও করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। কয়েকটা বিস্কুট থাকলেও হতো, কিংবা বাদাম...বা চকোলেট। উফ চকোলেট!

মনে আছে তখন ন্যান্সিবুড়ির গাব প্লেসের বাসা ছেড়ে আমরা উঠে গিয়েছিলাম কে-রোডের ওপরে বুড়িরই আরেক বাড়িতে, একদম অকল্যান্ড শহরের মাঝখানে। এই বাড়ির অবস্থা আগের বাড়ির চাইতেও কাহিল। কয়েকশ বছরের পুরানো দালানের বেজমেন্ট একটু রং করে ভাড়া দিয়েছিল বুড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হতো কবরে নামছি। দিনের বেলাতেও ফ্লুরোসেন্টের আলো জ্বালিয়ে না রাখলে কিছু দেখার উপায় ছিল না। বুড়ির ছিল নানা রকমের ব্যবসা। বাড়ি ভাড়া দেওয়া, গাড়ি চালানো শেখানো, ওকালতি। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টটা একটা পাবলিক লন্ড্রি আর অন্য আরেকটা প্রায় একই রকম অ্যাপার্টমেন্টের মাঝখানে। লন্ড্রিটাও বুড়িই চালাত। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যেত আমাদের দেওয়ালের লাগোয়া লন্ড্রির অফিস ঘর থেকে ভেসে আসা রেডিওর শব্দে। আর সারারাত ঘুমাতে দিত না পাশের ফ্ল্যাটের ছেলেটা। সে রোজ একটাই গান বাজাত বিকট জোরে আর তারপরেই শুনতাম কাগজ ছেঁড়ার শব্দ। এখানেই শেষ না। লন্ড্রির পাশের অ্যাডাল্ট শপ সারারাত খোলা থাকত। এমনিতেও কে-রোড

নাকি একসময়ে রেড-লাইট অঞ্চল হিসেবে বিখ্যাত ছিল। পরবর্তী সময়ে অনেক রকম দোকানপাট হয়েছে, তবুও অতীতের খ্যাতির কিছু কিছু এখনো ধারণ করে আছে।

বাড়ির পেছন দিকে সেই কোন জনমে সবুজ রং করা ভাঙা কাঠের দরজা খুললেই সিঁড়ি কয়েক ধাপ। সিঁড়ি পার হয়ে এবড়োখেবড়ো আর জঞ্জালে ভরা উঠানের এক কোণে আমাদের লাল হোন্ডা সিভিকটার জায়গা হয়েছিল। উঠানের উল্টোপাশে গির্জা। উনিশ শতকের তৈরি বিশাল কাঠের ইমারত। সামনের প্রশস্ত টানা বারান্দায় বেশ কিছু বেঞ্চ পাতা। দিনের বেলায় লোকের ভিড় থাকত, রাতের বেলা একদম সুনসান। কত নির্ঘুম মাঝরাতে আমার একাকী মন-কেমন-করার সাক্ষী হয়ে রয়েছে বেঞ্চগুলো!

কোনো কোনো সন্ধ্যায় আমি আর রাসেল ড্রাইভে যেতাম গির্জা আর আমাদের বাড়ির মাঝখানের ধুলাভর্তি, টায়ারের দাগওয়ালা অসমান পথটুকু পার করে। গলি থেকে বেরিয়েই কে-রোড। পুরো নাম কারাঙ্গাহাপে, মাওরি শব্দ, আল্লাহ জানে মানে কী। আদ্যাক্ষরটাই পরিচিত বেশি, উচ্চারণ সহজ। প্রথম দিন রাস্তা খুঁজতে গিয়ে এই নামের কারণেই সমস্যায় পড়েছিলাম আমরা। বুড়ি বলেছিল কে-রোড, অথচ ম্যাপের বইয়ের কোথাও আর খুঁজে পাই না। আবার রোড বলল না স্ট্রিট বলল সেই নিয়ে দুশ্চিন্তা, এই দোকান সেই দোকান, রাস্তাঘাটের মানুষজনকে প্রশ্ন করতে করতে নাস্তানাবুদ অবস্থা। নিজেদের যে কীরকম বাইরের লোক-বাইরের লোক লেগেছিল সেইদিন, যেন কারো বাড়ির দরজা খোলা পেয়ে বিনা আমন্ত্রণে ঢুকে পড়েছি। রাসেল তখন নতুন রাস্তায় গাড়ি চালাত আর বারবার পথ হারাত। আক্ষেপ করে বলত 'এই দেশের রাস্তা তো মনে হয় জীবনেও চিনমু না রে।' অথচ সিডনিতে এমন কোনো রাস্তা অথবা কানা-খোঁড়া-চিপা গলি ছিল না যা সে চিনত না। ওর বন্ধুরা ঠাট্টা করে ডাকত 'চিপা-রাসেল'।

এহেন চির অচেনা যে কে-রোড, তাও কয়েক মাস পরে কত আপন হয়ে উঠেছিল। আমাদের গলির মুখে, বাঁ পাশে ডিক-স্মিথ